Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 114 - 125
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 114 - 125
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

পূর্বাঞ্চলের কথাসাহিত্যিক ঝুমুর পান্ডের ‘স্বপ্নগন্ধার খোঁজে’ ও ‘সুখগাছের গল্প’ গ্রন্থে বহুমাত্রিক স্বর ও অন্তস্বরের অভিব্যক্তি

মাসুমা বেগম তাপাদার
গবেষক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম
Email ID : masumabegomtp@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Folk culture, Inner voice expression, Identity crisis, Struggle, Existence, Inequality.

Abstract

Jhumur Pandey was born to progressive and culturally concise family in Katlicherra Tea Estate of Hailakandi district, Assam. She started writing at an early age and her writings have been published in various journals and magazines. Pandey mainly writes about the predicament of tea garden workers and other marginalised communities.

In this essay we discussed about Jhumur Pandey's Selected two story book ‘Swopnogondher Khonje’ and ‘Sukh Gacher Golpo’. We can see here various lifestyle of people. This paper aims to focus on the Beauty of nature, identity crisis, struggle for existence, folk culture, belief system of some society, inequality, mindset of modern society, relationship between men and women, poverty and other social issues.

Discussion

সত্তরের দশকে সাহিত্যকেন্দ্রিক পত্রিকা ‘শতক্রতু’কে (১৯৭৩) আশ্রয় করেই বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পে বাংলার তৃতীয় ভুবনের বাস্তব আর নিজস্ব গল্প ভাষার সন্ধানে শুরু হয় নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং সেই সময়ের নবীন লেখকদের নতুন নতুন গল্প রচনার প্রয়াস। বঙ্গসাহিত্যের তৃতীয় ভুবন বা ঈশান বাংলা হিসেবে বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্য চর্চার স্বরূপ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখানে দুটো স্বতন্ত্র ধারা সুদীর্ঘকাল থেকেই প্রবাহমান। একটি ধারা, বৃহত্তর বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের প্রাণকেন্দ্র কলকাতাকে অনুসরণ করে চলেছে আর অন্য একটি ধারা নিজস্ব স্বকীয়তায় ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাহিত্যচর্চা মূলত অঞ্চল ভিত্তিক ভৌগোলিক অবস্থান এবং ঐতিহাসিকতার মূল প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্রে রেখে চলমান। এই দুটো ধারার সাহিত্যে বৃহৎ পার্থক্যও বর্তমান। কারণ, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক বিভিন্ন দিক থেকে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করছে দুটো ধারা। এদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান বলেই বৃহৎ প্রতিফলন দেখা যায় সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রেও। তাই বাংলা সাহিত্যের মূলধারার সঙ্গে উত্তর পূর্বাঞ্চল বা ঈশান বাংলার সাহিত্য চর্চার অনুশীলন, আকরণের মধ্যেও পার্থক্য গড়ে উঠেছে।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই ত্রিপুরা বরাক উপত্যকা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ছোটগল্প রচনার যে এক সমৃদ্ধ ধারা গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে তপধীর ভট্টাচার্য ও মিথিলেশ ভট্টাচার্যের দ্বারা সম্পাদিত শিলচর থেকে প্রকাশিত ‘শতক্রতু’

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 114 - 125
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

(১৯৭৩) অন্যতম। এই পত্রিকায় নানান রচনা স্থান পেতে শুরু করে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনাকর্ম। বিশেষ করে এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিলেন শক্তিশালী লেখকগুষ্টি। এই পত্রিকার মধ্য দিয়েই বরাক উপত্যকার গদ্য সাহিত্যের রুদ্ধমুখ গতিলাভ করেছিল। এভাবে আমরা দেখতে পাই, বিভিন্ন গল্পকারদের গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য ও নতুন নতুন বিষয়ের অনুসন্ধান যেমন, আত্ম পরিচয়ের লড়াই (identity crisis), ভাষারক্ষার প্রতিবাদ, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, মোহময় পরিবেশ, প্রতিরোধ, আশা নিরাশার দোলাচলচিত্ত, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা দিকের আঙ্গিকগত পরিবর্তন ও বিষয়বৈচিত্র্য।

বিবর্তনশীল সময়ের বহুমাত্রিক স্বর ও অন্তস্বরের বহুমাত্রিকতার অভিব্যক্তি নিয়ে লেখনীধারণ করলেন ঝুমুর পান্ডে। তিনি বরাক উপত্যকার প্রথম সারির লেখক গুষ্টির একজন মৌলিক লেখিকা। শৈশব কেটেছে বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দি জেলার চা বাগান ঘেরা কাটলীছেড়া অঞ্চলে। ১৯৫২ সালের দোসরা ফেব্রুয়ারিতে জন্মগ্রহণ ও দশ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত থেকেও তিনি শিলচর বেতার ও দূরদর্শন কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন এভাবে তিনি কলকাতা ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বাংলা ভাষায় গল্প লেখার জগতে কলম ধরেন। তিনি বিভিন্ন নারী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, বরাক উপত্যকার লিটল ম্যাগ লিটারারি ক্লাবের সাধারণ সম্পাদিকার দায়িত্বে কর্মরত থেকেও সমাজসেবী হিসেবে ও নিজের জায়গা করে নিয়েছেন।

ঝুমুর পান্ডে লেখেন মূলত চা বাগানের জনজাতি খেটে খাওয়া মানুষদের নিয়ে। তাদের জীবনশৈলী সমাজ পারিবারিক অবস্থার সঙ্গে নারী-পুরুষ সম্পর্ক, আধুনিক ভোগবাদী সমাজের উৎকট ব্যাধিগ্রস্থ ছবি, লোকসংস্কৃতি, বিশ্বাস রীতি-নীতি, রাজনৈতিক প্রভাবে তাদের জীবনের দুর্বিষহ অবস্থা, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাদের জ্ঞানহীন চক্ষু, ভাষা বৈচিত্র্য, জীবনযাত্রা সব মিলিয়ে এক বৃহৎ জনজাতির আত্মপরিচয়ের সন্ধানের পথ খুলে দেন ঝুমুর পান্ডে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লেখকদের মূল চালিকাশক্তি হল আত্মপরিচয় অর্জনের প্রয়াস এবং সংকটের সামনে ধারাবাহিক যুদ্ধ। শুধু ঝুমুর পান্ডে নন, এছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রথম সারির কথাসাহিত্যিক রণবীর পুরকায়স্থ, মিথিলেশ ভট্টাচার্য, বদরুজ্জামান, চৌধুরী, বিজয়া দেব, মীনাক্ষী সেন, স্বপ্না ভট্টাচার্যের মতো প্রমুখ লেখকেরা তাঁদের প্রতিভা ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আঞ্চলিক জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে সামনে রেখেই বরাক উপত্যকার লেখক গুষ্টির পথ চলা। তৃতীয় ভুবনের গল্প লেখকদের নানান গবেষণা ও আলোচনাকর্ম অবিরত ধারায় চলছে যার ফলস্বরূপ আমরা অজানা, অচেনা জগত জীবন ও বিষয় সম্পর্কে অবগত হই।

ঝুমুর পান্ডের গল্পগ্রন্থের সংখ্যা অন্যান্য লেখকদের তুলনায় কম সংখ্যক হলেও তিনি তাঁর গল্পের কাহিনিবয়ন, বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করতে পেরেছেন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও নিজস্ব চোখে দেখা অঞ্চল, পথ ঘাট, মাটি প্রকৃতি ইত্যাদি জায়গা থেকে। তিনি এভাবে এক মৌলিকতার জগত সৃষ্টি করেন সুদক্ষ দ্রষ্টার ন্যায়।

এ প্রসঙ্গে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রথম সারির সমালোচক তথা প্রাবন্ধিক অধ্যাপক তপধীর ভট্টাচার্য তার প্রবন্ধ 'অভিজ্ঞানের সূত্রসন্ধান : প্রেক্ষিত বরাক উপত্যকা' গ্রন্থে বলেছেন,

> "মিখায়েল বাখতিন যেমন ধারাবাহিক উন্মোচনে চক্ষুষ্মান হওয়াকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তেমনি উত্তর-পূর্বের গল্পকারদের আর্তি মুখ্যত বন্ধ কপাটগুলি খুলে দেওয়ার জন্যে। নিশ্চিদ্র যে অন্ধকার ব্যবহারিক ও আত্মিক পরিসরে ঘনায়মান তার মধ্যেই তাঁরা দৃষ্টিযুক্তির আয়োজন করেছেন এই হল বার্তা।"[১]

প্রথমেই আমরা দেখে নেব, ঝুমুর পান্ডের প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলো - 'গেরাম থানের মানুষটা ও দুলিয়া' (১৯৯৭), 'স্বপ্নগন্ধার খোঁজে' (১৯৯৯), 'সুখ গাছের গল্প' (২০০৫), 'জল খাবেন বনদুর্গা' (ভাদ্র ১৪২০, সেপ্টেম্বর ২০১৩) । প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কিছু বলার ছিল' উপন্যাসের মধ্যে 'গাঙ গাথা, আলেকজান্ডারপুরের কথকতা', 'পিন্তি ও সেই স্বপ্ন পাখি সুরেলা'র ছোটদের জন্য গল্পগ্রন্থ প্রভৃতি রচনাকর্মের নিপুন প্রয়াস করেছেন।

আলোচ্য 'স্বপ্নগন্ধার খোঁজে' (১৯৯৯), 'সুখ গাছের গল্প' (২০০৫) এই দুই গ্রন্থের আলোচনায় মনোনিবেশ করার প্রয়াস করব। দুটো গ্রন্থের গল্পের রসাস্বাদে বহুমাত্রিক স্বর সংযোজন করে কীভাবে বিষয় বৈচিত্র্যের এক আলাদা রূপায়ণ ঘটিয়েছেন তার এক বাস্তবরূপ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। যা সমস্ত পাঠকের চোখে অবিরাম চেষ্টার ফসল হিসাবে রূপলাভ করেছে।

প্রাবন্ধিক রামী চক্রবর্তী তাঁর 'ঝুমুর পান্ডের ছোটগল্প, ব্রাত্য সমাজের অন্তঃস্বর' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন গল্পকার ঝুমুর পান্ডের নিজস্ব উক্তি। ঝুমুর পান্ডে নিজের গল্প সম্বন্ধে পাঠকদের অবগত করেছেন,

> "আমার গল্পের ভুবন মূলত চা বাগানের জনজাতি ও খেটে খাওয়া মানুষদের নিয়েই। ওদের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্খা সর্বোপরি ওদের উপর শোষণ আমার গল্পগুলোতে তুলে ধরতে চেয়েছি। চরিত্রগুলো আমার খুব আপন দুচোখ দিয়ে দেখা। সেই মানুষগুলো আমার গল্পের চরিত্র হয়ে উঠেছে।"[২]

ঝুমুর পান্ডে ১৯৯৭ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে লেখা গল্পগুলোর মধ্যে বৃহত্তর সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। তিনি ছয়ের দশকের শুরুতে (১৯৬২) জীবন শুরু করলেও মাত্র তেরো বছর বয়সে তিনি লিখেছেন 'জীবন যাদের ভাঙাচোরা' (১৯৭৫)। এটি বরাক উপত্যকার চা বাগান নিয়ে লেখা তাঁর প্রথম ছোটগল্প। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনি লিখে যাচ্ছেন অজস্র কবিতা, উপন্যাস, গল্প, প্রভৃতি। ঝুমুর পান্ডের 'গেরাম থানের মানুষটাও দুলিয়া' প্রথম গল্প গ্রন্থের গল্পটি আসলে চা বাগান শ্রমিকের একটি কেন্দ্রীয় সমস্যা। মিথ্যা মার্ডার কেসের মামলায় দুলিয়ার স্বামীর জেলে যাওয়া এবং তার জামিনের জন্য সামান্য টাকায় দুলিয়ার নিজের একমাত্র সম্বল জমিটি বেচে দেওয়া যেন শোষক শোষিতের চেনা সমীকরণ বলা যায়।

প্রান্তিক জনজাতির মানুষেদের নিয়ে যে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য রচনা হয়েছে, যেমন– 'লুধা শবরদের মা' তেমনি 'হাজার চুরাশির মা'ও। এ রকম আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে একজন কথাকার তিনি বরাক উপত্যকার চা জনজাতিদের জীবন যন্ত্রণা সংগ্রাম, সংস্কারকে তার সাহিত্যপ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন।

'স্বপ্নগন্ধার খোঁজে' গল্পগ্রন্থে ষোলোটি গল্প ও 'সুখ গাছের গল্প' গ্রন্থে মোট ন'টি গল্পের সংমিশ্রনে গ্রন্থ দুটোর আখ্যানবয়ন করেছেন গল্প লেখিকা। যেহেতু লেখিকা নিজেই বলেছেন, তার গল্পের বিষয়বৈচিত্র সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা শোষণ নির্যাতন সবই নিজের চোখে দেখা বাস্তবতার উপকরণ। তিনি তাদের ভালোবাসায় সিক্ত আপ্লুত। এ থেকে বোঝা যায়, লেখিকার জীবন দর্শন থেকে উঠে এসেছে গল্পের কাহিনি। তিনি সচেতনভাবেই বিভিন্ন বিষয়র বহুমাত্রিক স্বর সংযোজন করেছেন, তাই দেখা যায় আধুনিক ভোগবাদী সমাজ জীবন, আত্মপরিচয়ের লড়াই, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, জীবন সংগ্রাম, নারীপুরুষ সম্পর্ক, নারীর অবস্থান, আঞ্চলিকতা, প্রকৃতি উপভাষার ব্যবহার, লোকসংস্কৃতি, বিপন্ন সময়, নারী পাচার, নিষিদ্ধ পল্লী, সমকালীন সমাজ বাস্তবতা, মিশ্র জনজাতি, ভাষা ব্যবহার, পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়। আমরা জানি ছোটগল্প হচ্ছে সময়ের প্রিয় সন্তান।

'স্বপ্নগন্ধার খোঁজে' গ্রন্থের নাম গল্পের দিকে তাকালে দেখতে পাই ষোলোটি গল্প জুড়ে লেখিকা বিভিন্ন বিষয়ের উত্থাপন করেছেন। এই গল্পে আধুনিক ভোগবাদী সমাজের এক উৎকট ব্যধিগ্রস্ত ছবি তুলে ধরেছেন। সৎ শিক্ষিত উচ্চপদস্থ কর্মচারী স্বপ্নময় এর নামের মধ্যেই রয়েছে এই গল্পের চাবিকাঠি। একটি সুন্দর সমাজের স্বপ্ন দেখেন স্বপ্নময় পাশাপাশি তার কাঙ্ক্ষিতও কল্পিত নারী যুঁই বার বার তার স্বপ্নে দেখা দেয়, যুঁইয়ের সুবাসের মতোই মিশে থাকে সে স্বপ্নময়ের জীবনে। গল্পে তাই দেখা যায়,

> "স্বপ্নময় এখন যুঁই গন্ধ গায়ে মেখে বাইরে এসে আকাশের দিকে তাকায়।"[৩]

তাই স্বপ্নময় তার নাম দিতে চায় -

> "তোমাকে একটা নাম দিই।
> দাও।
> স্বপ্নগন্ধা।"[৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 114 - 125
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্বপ্নগন্ধা ও দেখতে স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে তবে রানী হওয়ার স্বপ্ন দেখে না। নির্লোভ মানসিকতার স্বপ্নময়ের মতো। গল্পের মধ্যে দেখা যায়,

> "তুমি এত স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসো?
> রানী হওয়ার স্বপ্ন তো দেখি না। দেখি সূর্য ওঠার স্বপ্ন। সব যন্ত্রণা কালিমা নিরাময়ের স্বপ্ন।"[৫]

সে দেখে যন্ত্রণা কালিমা নিরাময়ের স্বপ্ন। এর বিপরীতে রয়েছে স্বপ্ন আমার স্ত্রী বিপাশা। বাড়ি, গাড়ি, কালার টিভির মতো ভোগ্যপণ্য ছাড়াও মেয়েকে নামীদামী স্কুলে ভর্তি করতে না পেরে আক্রোশে মেয়ে ডানার হাত ভেঙ্গে দিয়েছে। গল্পে তার নাম ডানা অর্থাৎ উড়ার আগেই ডানা ভেঙে দেওয়া গভীর অর্থব্যঞ্জক হয়ে ওঠে। গল্পের নামের মধ্যেই একটি খোঁজ রয়েছে যেভাবে প্রত্যেকটি মানুষ তার স্বপ্ন গন্ধার খোঁজে নিরন্তর ধারায় প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের শিরায় শিরায় বহমান গন্ধমাখা স্বপ্ননামের সুখ, আনন্দ। স্বপ্ন পূরণের পথের যাত্রা যার মধ্যে রয়েছে জীবনের সহস্র সংগ্রাম। গল্পের নামের মধ্যে যে খোঁজ রয়েছে, সেই খোঁজ দুদিক থেকে সার্থকতার পথে পা বাড়ায়। একদিকে, একটি বস্তুতন্ত্রে হাঁপিয়ে যাওয়া স্বপ্নময় দাম্পত্য জীবনে মানসিক শান্তি ও আশ্রয় না পেয়ে কল্পিত এক নারীর সাহচর্য গ্রহণ করে যার উপস্থিতি প্লাটনিক লাভের (Platonic Love) মতো। আভিধানিক অর্থে বিশুদ্ধ বা আত্মিক ভালোবাসা। যেখানে কামনা-বাসনার কোনো স্থান নেই। যাকে বলে নিষ্কাম ভালোবাসা। স্বর্গসুখ প্রাপ্তির অনুভূতি নিয়ে মেয়ে ডানাকে নিয়ে বাড়ির বাইরে প্রকৃতির কোলে এসে সান্ত্বনা খোঁজা স্বপ্নময় আসলে ইউটোপিয়ার দেশে পা বাড়ায়। এখানে ও লোভহীন আকাঙ্ক্ষাহীন সাদামাটা জীবনের সন্ধান। তবে আপাদমস্তক আদর্শবান শিক্ষিত স্বামীর প্ররোচনায় স্ত্রীর গায়ে হাত তোলায় পাঠকের খটকা লাগে। ডানার ইন্টারভিউ পাস না করা এবং দুজনের মধ্যে আধুনিক অসুখ ধীরে ধীরে প্রবেশ করে জীবনের আনাচে-কানাচে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করে। বিপাশা নিজের স্বামীকে 'গেয়ো ভূত', আনস্মার্ট দোষারোপ করা, কালার টিভি কিনতে না পারার জন্য নিচু মানসিকতার বলে তুচ্ছ জ্ঞান করা, নতুন গাড়ি না কেনার বেকারত্ব, অফিসের পিয়নের থেকে নিচু বলে তকমা দেওয়া ও বিপাশার বাবার দেওয়া জিনিসপত্র না নেওয়ার জন্য 'গাধা' শব্দ সম্বোধন করা প্রভৃতি বিষয় যেন স্বপ্নময়ের হৃদয়মন অসহ্য অসুখের ব্যথার মতো বোধ হতে শুরু করে। তাই আমরা গল্প দেখতে পাই,

> "স্বপ্নময়ের হাতটা এখন বিপাশার গালে বসে যায়।"[৬]

অর্থাৎ বিপাশার সীমা লংঘন করার মধ্যেও স্বপ্নময়ের জীবন সম্বন্ধে দাম্পত্য জীবনের অসুখ বিনাশ করা উচিত বলে ভেবেছে। তাই স্বপ্নময় বিপাশাকে বলে ওঠে -

> "হ্যাঁ তোমার মতো আধুনিক অসুখকে বিনাশ করা ই উচিত।"[৭]

এভাবে গল্পের আখ্যান ভাগে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এক আধুনিক ব্যাধি যার শেষ পর্যায়ে দেখা যায় আধুনিক ব্যাধির শেষ পর্যায়ে দেখা যায়— বিপাশা ও স্বপ্নময়ের বাড়ির নিস্তব্ধতা শুনশান পরিবেশে আবৃত।

> "শুনশান বাড়িটার হাড় পাজরে আধুনিক অসুখের কীট দাবড়ে বেড়ায়। মাঝরাতে বিপাশা আধুনিক অসুখ মেখে গভীর ঘুমে অচেতন।"[৮]

গল্পকার বলছেন–

> "আধুনিক কীট আজ সবার দেহেই বাসা বেঁধেছে।"[৯]

এই অসুখ থেকে মুক্তি পেতে স্বপ্নময় ডানাকে বুকে চেপে বাইরে বেরিয়ে আসে। ডানা স্বপ্নময়কে জিজ্ঞেস করে তারা কোথায় যাচ্ছে, স্বপ্নময় বলে ওঠে,

> "যাচ্ছি সোনা ফুল পাখিদের দেশে। স্বপ্নগন্ধার দেশে।"[১০]

এভাবে গল্পের আখ্যানভাগে স্বপ্ন জীবন এবং বাস্তবতার ন্যায় প্রতিটি সম্পর্কেই যেন অসুখ ছড়াতে শুরু করে। প্রতিটি সম্পর্কে যেন বিষাক্ত ধোয়ার ন্যায় প্রবেশ করে আধুনিক ভোগবাদী ভাবনা। স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রী স্বামীকে মানুষ বলে বিবেচনা করার চেয়ে গুরুত্ব দিতে চেয়েছে লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা এবং চাহিদার চরম শিখরে। যেন প্রতিযোগিতা

চলছিল জীবনের লালসায়। এভাবে স্বপ্নময় মাঝরাতে বিবাগী চাঁদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে থাকে এক নতুন দেশে। গল্পকার খুব স্বচ্ছ ভাবে সাবলীল ভাষা প্রয়োগে নিপুনভাবে বুঝিয়ে দিলেন প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে স্বপ্ন গন্ধা নামের খোঁজ প্রবহমান। সবশেষে যেন কোথাও শান্তির আশ্রয়স্থলের জীবন সংগ্রাম। অন্যদিকে দেখাচ্ছেন কীভাবে মানুষের জীবনে বিপন্ন আধুনিক ভোগবাদী ভাবনা সম্পর্কের মধ্যে ফাটল বা অসুখের মতো নষ্ট করে দিচ্ছে সুন্দর জীবন। ঝুমুর পান্ডে নিজেই আধুনিকতার নাগরিক অসুখী জীবনের দৃষ্টির মধ্যে তুলে ধরেছেন আমরা সবাই যেন একটা স্বপ্ন গন্ধার খোঁজে। সেই পরশপাথর খোঁজার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি সারা জীবন ধরে। কিন্তু স্বপ্নগন্ধা অধরা অপ্রাপনীয়া সোনার হরিণ হয়েই থেকে যায় — আমাদের কাছে তবু অন্বেষা। এই অন্বেষণের নামই সাহিত্য জীবন কাব্যশিল্প সঙ্গীত সবকিছু।

'সুখ গাছের গল্প' সংকলনে 'বিলোড়িত স্বপ্নেরা এবং সুলোচনা দুই' গল্পে বাস্তব জীবনে সুলোচনা স্বামী শুভম ও ছেলে পপাইকে নিয়ে তাদের সংসার। শুভম মদ খায় এবং তার রূপা দত্ত নামে একটি মেয়ের সঙ্গে অ্যাফায়ার চলেছে নিশ্চিন্তমনে।

"রুপা দত্তের সাথে একটা অ্যাফায়ার চলছে। সবই জানে সুলোচনা তবু...।"[১১]

একটি শীলিত সমাজের মানুষ হয়েও শুভম নিজের স্ত্রীকে চড় মারে এবং ডিভোর্স দিতে বলে।
"শুভম কাল রাতে বলেছিল ইচ্ছে হলে তুমি ডিভোর্স নিতে পারো। দুচোখ ছাপিয়ে জল আসে সুলোচনার মানুষ এত বদলে যেতে পারে। এই শুভমই এক সময় ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করে থাকতো সুলোচনার জন্য।"[১২]

এভাবে যে স্ত্রীর সামনে নিচু হতে থাকে। সুলোচনার ও পছন্দের একজন রহিত নামের পুরুষ ছিল।কাঁদতে কাঁদতে সে স্থির করে রহিতের কাছে চলে যাবে। এদিকে স্বপ্নের জীবনেও ও সুলোচোনা বর সুবল, ছেলে মঙ্গলকে নিয়ে সংসার করে। সুবল মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকে,এবং শ্যামরতী নামের এক স্ত্রীলোকের ঘরে রাত কাটায়। সুলোচনা অনুযোগ করলে তাকে কষে চড় মারে। স্বপ্ন ও বাস্তব জীবনে সুলোচনার জীবন চিহ্নিত। দুটি জীবনই বহুর মধ্যে স্বপ্ন আর বাস্তবের। জীবনের স্বপ্ন আর কল্পনার মধ্যে তফাৎ এটাই যে, যা স্বপ্ন তা সর্বদা কল্পনাতীত তার যা কল্পনা তা স্বপ্ন থেকেও অধিক।

'সুখ গাছের গল্প' গ্রন্থে নাম গল্পে সেখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র রামবাসিয়া। তাদের প্রান্তিক জীবনে ও আদর্শ ও সুসংস্কৃতির একটি নজির গড়ে তোলার চেষ্টা করে তার বঞ্চিত জীবনে। বিট্রেইয়াল বা ফাঁকি চা বাগানের মানুষদের সঙ্গে ওত: প্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।' চল মিনি আসাম যাব' এই লোকগানের মধ্যেই রয়েছে 'ফাঁকি দিয়া পাঠাইলি আসাম'। এই গল্পে অষ্টাদশী রামবাসিয়াকে চন্দ্রমণি সার্কাসের মাহুত ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে বিয়ের দিনে।

"তারপর এক স্বপ্নের নদীতে হাবুডুবু। নিরন্তর। সার্কাসটা এক সময় খেলা শেষ করে চলে গেল।"[১৩]

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় প্রতারিত হওয়া আসলে তার বিশ্বাস টলিয়ে দিয়েছে মানুষের প্রতি। মনে পড়ে যাবে আসামের হস্তির কন্যা প্রতিমা বড়ুয়ার গানের কথা - 'গেলে কি আর আসিবেন মাহুত বন্ধুরে'। না আর আসেননি। কিন্তু রামবাসিয়া তার সন্তান ভারতকে লালন পালন করেছে কোন পুরুষের সাহায্য না নিয়েই। ভাগ্যের করুণ পরিহাসে তার ছেলে বড়ো ভরতও পলায়ন পর বাবার মতো। একমাত্র নাতি লক্ষিন্দরই তার সম্বল। রামবাসিয়া যতই সাহেব, বাবু, পঞ্চায়েতকে বলে নাতি লক্ষিন্দরের জন্য কাজের ব্যবস্থা করুন না কেন লক্ষিন্দর রেডিও টেপের দোকান দিতে আগ্রহী। উগ্র হিন্দি গানের কলি তার ঘরে বাজে। দোকান করার জন্য অনায়াসে ঠাকুমার ফান্ডের টাকা দাবি করেছে। সে আর সেই টাকা পাওয়া না গেলে স্বচ্ছন্দে ভিটেমাটি বিক্রি করে দেওয়ার প্রস্তাবও দেয়। আসলে লক্ষিন্দরদের প্রজন্ম অন্ধের মতো সুখের পিছনে ছুটছে। যা দেখিয়ে সুখ কেনা যায়, সেই রিভলবরকে নাতির ঘর থেকে খুঁজে পায়। রামবাসীয়ার পুত্রবধূর অকাল মৃত্যুর পর তার একমাত্র নাতিকে নিয়ে সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করার স্বপ্ন আসলে সুখ গাছের গল্পকেই প্রলম্বিত করে। কিন্তু সুখ অধরাই থেকে যায়। রামবাসিয়াকে মনে মনে ভাবতে দেখা যায় -

"অশান্তির অর্ঘ্য মানুষ নিজেই সাজিয়েছে শান্তি দেবী তাই আজ ঘরছাড়া।"[১৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 114 - 125
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মানুষ সুখের গাছকে উপড়ে ফেলেছে দামাল ষাঁড়ের মতো, দুপাটি ফুলের বিচিতে এখন আর আগের মতো দুপাটি গাছ হয় না, রামবাসিয়ার জীবনে হারানো কত ফুল ফল কিভাবে হারিয়ে গেল সে ঠাহর করতে পারেনা। আসলে গল্পকার রামবাসিয়ার নিভৃত মনের গোপন ব্যথার সঞ্জীবনী সুধা সুখ গাছকে জীবনের অবলম্বন মাত্র করে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন সুখের নাগাল না পাওয়া রামবাসিয়ার মতো অজস্র মানুষ।কেউ বা আবার ঘরের কোনে নিজস্ব সুখ গাছ খুঁজতে খুঁজতে একদিন হারিয়ে যায়। সুখের গাছ কোথায় রোপন করবে সেই তল্লাশই যেন রামবাসিয়াকে দিয়ে গল্পকার চমৎকার ভাবে উত্থাপন করেছেন।

> "না মাথা ঘুরে পড়ছে না রামবাসিয়া। মাকড়সার জাল থেকে বেরিয়ে উপড়ানো সুখের গাছটাকে আবার ঘরের কোথায় পুঁতবে মাথাটা হেলিয়ে তাই ভাবছে রামবাসিয়া।"[১৫]

এভাবে ঝুমুর পান্ডে এরকম গল্প গুলোর আখ্যানভাগে বৃহৎ পটভূমি কাজ করেছে মানুষের স্বপ্ন ও সুখের তল্লাশে অতিবাহিত জীবনের করুণ ও সংগ্রামী চিত্র। তিনি বিভিন্ন গল্পে কিছু বাস্তব জীবনের চোখে দেখা জীবন্ত ঘটনা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। গল্পকার জীবনের রঙ্গমঞ্চের এক পৃষ্ঠে রেখেছেন সমাজ জীবন এবং অন্য পৃষ্টে এঁকে চলেছেন প্রত্যেকটি সমাজ জীবনের মধ্যে চলতে থাকা মানুষের জীবনধারা ও সময়ের বাস্তব রূপ। সুখসন্ধানী মনোভাব ও স্বপ্নগন্ধার বিচিত্র প্রয়াস। যার মধ্যে গল্পকার নানান ফুল, প্রাণী, আলো, আঁধারের ব্যবহার করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চান উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনজাতির জীবনধারা ও সময়ের বাস্তব রূপ।

এরকম 'স্বপ্নগন্ধর খোঁজে' সংকলন গ্রন্থে আরেকটি গল্প 'যাজ্ঞসেনী এবং অন্তর্নিহিত স্বপ্ন' গল্পে এক নারীর মনস্তাত্তিক টানা পোড়েনের মিষ্টি মধুর গল্প। যাজ্ঞসেনীর ভরা সংসারে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে একচিলতে দুঃখ হয়ে বেঁচে থাকে শৈশবের সৌম্যের স্মৃতি -

> "দু'চোখে স্বপ্ন। স্বপ্নতো যাজ্ঞসেনীরও ছিলো। দু'চোখ ভরা স্বপ্ন। তুমি এতো স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসো যাজ্ঞসেনী।"[১৬]

জীবনে স্বপ্ন দেখতে ভালোলাগা ও সৌম্যের স্মৃতি মধুর জীবনের সঙ্গে বিজড়িত অনুভূতি। তেরো বছর বয়সে বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, কালিদাস সব পড়েছিল। সৌম্যও পড়তে ভালোবাসতো। লেখালেখি, আলোচনা পছন্দ করত তাই গল্পে দেখা যায়,

> "যাজ্ঞসেনীর সমস্ত সত্ত্বা, সমগ্র কৈশোর জুড়ে সৌম্য। আশ্চর্য যাজ্ঞসেনী বুক থেকে সরাতে পারলেন না সোম্যকে। অবসর নেওয়ার পর থেকে যেন আরো বেশি করে বুক জুড়ে বসে আছে সৌম্য।"[১৭]

যাজ্ঞসেনীর কাছে সে স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। নারী মনের গভীর অভিমানবোধ থেকে অগ্রাহ্য করেছিলেন তিনি। কিন্তু সময় উপান্তে পৌঁছেও এই প্রেমের সঞ্জীবনী ধারা যে তাকে তাকে সতেজ রেখেছে এটাই তার অন্তঃবয়সের আবিষ্কার। যাজ্ঞসেনীর ভাবনার গভীর অতলে রয়েছে সৌম্যকে নিয়ে জ্বালা। সৌম্য বিদেশী রমনীর কাঁধে ধরা, সোফায় আরেক বিদেশিনীর সঙ্গে বসা, মেনে নিতে পারে না যাজ্ঞসেনী। সম্মুখে চিঠিতে লিখেছিল -

> "আই হেট য়্যু। আই হেট য়্যু।"[১৮]

এভাবে দেখা যায় যাজ্ঞসেনীর আজীবন লালিত সৌম্যের প্রতি থাকা ভালোবাসা, অভিমান সমস্তই যেন সময়ের বিপন্ন পাঁচালীর ন্যায় ঝাপসা হতে থাকে। কপালে হাত রেখে অনুভব করতে চাইলে চোখের জল ঝরতে থাকে সৌম্যর কপালের উপর কিন্তু পরক্ষণে পাখির ডাক এবং বাস্তব জীবনে ঘুরে আসার মধ্যেই যেন গল্পের মোড় ঘুরে আসে -

> "ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসেন যাজ্ঞসেনী। সত্যিই ভোর হচ্ছে জেগে উঠছে গাছ গাছালি পথ ঘাট।"[১৯]

ঝুমুর পান্ডে এই গ্রন্থের 'আতঙ্কের হিমঘরে আমি ও আমার মেয়ে' নামক গল্পের উত্থাপন করেছেন যার মধ্যে ফুটে উঠেছে সময়ের বিপন্নতার পাঁচালী কাব্যিকতার আদলে সুরঙ্গ লালিত সময় ও বিপন্ন পরিস্থিতি। গল্পের শুরু থেকেই দেখতে পাই সাম্প্রদায়িকতার শিকার নিরপরাধ মানুষের পুড়া গন্ধ। নাকে এসে ঝাপটা মারে। এখানে মা এবং মেয়ে যেন দুই প্রজন্মের

মধ্যেকার সর্বব্যাপ্ত ভাঙ্গনের যোগসূত্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গল্পের শুরুর দিকেই ঝুমুর পান্ডে খুব সুন্দর ভাবে সুস্থ চেতনায় কীভাবে অবিচারের পুড়া গন্ধ প্রবেশ করে জীবনকে হতাশার মুখে ঠেলে দেয় তার বর্ণনা করেছেন।

"হয়তো অন্যায় আর অবিচারের গন্ধ এমনি করেই ঝাপটা মারে পৃথিবীর প্রতিটি সুস্থ চেতনায়।"[২০]

লেখিকা কিছু ফুলের নাম আনয়ন করেছেন - শিউলি, জুঁই, কামিনী, বেলি, হাসনহানা এবং কিছু শব্দ যেমন অন্যায়, অবিচার, উদ্বাস্তু, দীর্ঘশ্বাস, সুস্থ চেতনা, পোড়া গন্ধ, এক ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুর দীর্ঘশ্বাস, প্রভৃতি শব্দ ইঙ্গিতধর্মী অর্থ বহন করে। মা নামের চরিত্রেরা রাত জাগা পাখির ন্যায় ডানা ঝাপটানে, এবং তারই মধ্যে আঠারো বছরের মেয়ের জেগে উঠা মেয়ের বাচনিক কাব্যিকতার ভাষা যেন এক বিপন্ন সময়কে প্রতিকায়িত করে।

"তুমি যেখানে বোমা ফেলবে —
আমার ভাই সেখানে পড়তে বসেছে
তুমি যেখানে বোমা ফেলবে
আমার বোন পুতুল নিয়ে খেলছে..."[২২]

কথাগুলোর মধ্যে মায়ের মনে এক আতঙ্ক কাজ করে ও মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। মা ও মেয়ে মানুষের পোড়া গন্ধ, দীর্ঘশ্বাসের শব্দ সব কিছু নিজের স্নায়ুতে শিরায় শিরায় অনুভব করতে থাকে। রাত জাগে ভোর হয়। এখানে গল্পকার সময়ের মাঝখানে এক একটি সত্তা আরেকটি সত্তার অংশীদার হওয়ার প্রত্যয়ের নির্দেশনা দেয়।আমরা জানি সত্তা মানে সমান্তরালতার বোধ। যাকে বাখ্‌তিন ভাষ্যে বলা হয় 'প্রতিটি সত্তাই সহযোগী সত্তা।'

রূপকের সাহায্যে গল্পকার দেখাতে চাইলেন যে এই আতঙ্ক কিসের? কিসের দীর্ঘশ্বাস? কিসের ভয়ঙ্কর আর্তনাদ? উদ্বাস্তুর মতো এক ভাবনা থেকে অন্য ভাবনায় ত্রাসের সঞ্চার করে বেড়াচ্ছে পালা বদলের মতো। বিপন্ন সময়ের উৎপাদন এবং উৎপাদক ভাঙ্গাচুরা মানুষের রূপক। শোষণ নিপীড়নের লাগামহীন অন্ধকারই শেষ কথা হতে পারে না। তাই মা মেয়ের মুখের আতঙ্কগ্রস্ত চোখের সামনে বলেন,'হে ঈগল' মা ও মেয়ের চেতনায় পোড়া মাংসের গন্ধ, দীর্ঘশ্বাসের শব্দ, কিভাবে চেতনায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে কিন্তু তিনি নিশ্চিত জানেন একদিন এই ডানা দুটো মুখ থুবড়ে খসে পড়বে।
"আর আমি এই পৃথিবী থেকে সরে যাওয়ার আগে আমার মেয়েকে তা বলে যাব তবে চুপি চুপি নয়। সরবে।"[২৩]

ঈগল পাখি হয়ে ওঠে সমস্ত রকমের পাশবিক মহাসক্রমনের তীব্রতার প্রতীক। লেখকের জাগ্রত সত্তায় সমস্ত কিছু জ্যান্ত ও জীবন্ত বাণী ধ্বনিত হয় প্রতিবাদের মতো। একদিন এই পাশবিক-সত্তার বিনাশ ঘটবে তাই লেখক আক্ষেপের উচ্ছাস সরবতায় একদিন ভরে উঠবে বলে বিশ্বাস করেন। সমস্ত আতঙ্ক ভয় সব কাটিয়ে একদিন জেগে উঠবে জাগ্রত ত্রাসহীন মুক্ত সত্তা।সময় ও তার বিম্বিত পরিস্থিতিকে লেখিকা খুব সুনিপুনভাবে ভাবে দেখিয়ে দেন মা ও মেয়ের কথোপকথনে। স্বল্প ভাষা ব্যবহার, রূপক ব্যবহার এক্ষেত্রে লেখিকার কলম জোর কদমে এগিয়েছে পাঠক হৃদয়ে।

'সুখ গাছের গল্প' গ্রন্থে 'রাইতা ভালো আছে কিন্তু', 'স্বপ্নের ছবি' গল্পগুলো সাধারণ মনের। 'উজান', 'কানাই এর কিছুক্ষণ' গল্পে যে সমস্ত সমস্যার কথা গল্পে বলা হয়েছে তার সবগুলোই বাস্তব সমস্যা এবং দৈনন্দিন জীবনের অসহায়তার গল্প এবং গল্পগুলি তাদের প্রয়োজনীয় ব্যক্তি এবং গভীরতা পেত, বাস্তবে যা হয়নি এসব কথা ও কাহিনী স্বীকৃত সমাজের অনেক গভীরে প্রকৃত মন্থন করলে গল্পগুলো তেমন গভীরতা প্রাপ্তি হয়নি।

চা শ্রমিকদের লবণাক্ত জীবনের কথা ঝুমুর পান্ডের প্রধান বিষয়। যদিও শহর ভিত্তিক নাগরিক জীবনের গল্প তিনি আমাদের শুনিয়েছেন, শুনিয়েছেন প্রত্যন্ত গ্রাম জীবনের গল্পও। 'সুখ গাছের গল্প' সংকলনের প্রথম গল্প 'মোক্ষদা সুন্দরীর হারানো প্রাপ্তি' শিলচর শহরের উপকণ্ঠে মেহেরপুর উদ্বাস্তু ক্যাম্পে দমচাঁপা একটি ঘরে প্রায় আশী বছর বয়স্ক বৃদ্ধা মোক্ষদা দিনরাত অতীত কল্পনায় বিভোর থাকেন। অতীতের স্বর্ণ স্মৃতি অবলম্বন করেই তিনি অতিকষ্টে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেন। দেশভাগের স্মৃতি, তীব্র বেদনাবোধ, ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুবিন্দুর মতো গল্পের শব্দে শব্দে ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে থাকে।

"পার্টিশন শব্দটাই কেমন গুঁড়িয়ে দেয় মোক্ষদার হাড় পাঁজর অস্থিমজ্জা সব। কেমন করে ছোট্ট একটা শব্দই শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলল মোক্ষদার ঘর সংসার পরিচিত আবাল্য লালিত পরিবেশ।"[২৪]

বাক্যে সংলাপে ঝুমুর তৈরি করেন পার্টিশন বিদ্ধ সেই অবিভক্ত সোনার বাংলাকে, একদিন যা লক্ষ লক্ষ মোক্ষদাকে পিছনে ফেলে আসতে হয়েছিল। মোক্ষদা হারিয়েছেন আত্মীয় স্বজন, বিশাল সুন্দর এক সুখ দুঃখ ভরা জীবন কিন্তু প্রাপ্তির কোঠা প্রায় শূন্য।

"মানুষ কিছু একটা নিয়ে বাঁচে। মোক্ষদা বাঁচেন স্মৃতি নিয়ে। স্বপ্ন নিয়ে। কষ্ট নিয়ে। সহানুভূতি নিয়ে।"[২৫]

ঝুমুর পান্ডে সহজ সরল ভাষায় ছোটো গল্পের এক রৈখিক আঙ্গিকে এই হৃদয় বিদারক ঘটনা আমাদের শোনালেন।গল্পে মোক্ষদা ভাবনায় সন্তান ও স্বামীকে ফিরে পাওয়ার কল্পনা করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন স্বামীকে -

"পার্টিশন নু।কেমনে আইলা?
উত্তরে স্বামী বলেন
"মানুষের মনরে পার্টিশন দিয়া বান্ধা যায়নিগো?"[২৬]

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে 'মনোহরের মা' নামক গল্প। মনোহরের মায়ের সব ছিল কিন্তু স্বজন হারানোর বেদনা মনোহরের মাকে কোথাও শান্তি দেয়নি। তাই বারে বারে ছড়া কেটে যান মনের অব্যক্ত বাসনা প্রকাশের জন্য। এভাবে আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন গল্পে দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, স্বজন হারানোর ব্যথার করুণ পরিণতি ও প্রচুর উদাহরণ দেখতে পাই।

'সুখ গাছের গল্প' গ্রন্থের 'মধুরাবতী সাঁতার কাটে' গল্পে রূপছড়া বাগানের আট বছরের মেয়ে মধুরাবতী দুবেলা দু-মুঠো নিশ্চিন্ত আহারের জন্য ভাই বোন ও মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শহরের ধনী পরিবারের কাজের লোক হিসেবে স্থান পায়।

"ঘরের রাঁধা বাড়া তো সব রাঁধুনি বা মধুরাই করে। অবসর সময়ে বাগানের ঘাস বাছে মধুরাবতী। আট বছরের মেয়েটার শরীরে মনে কত আর সয়?"[২৭]

মেয়েটি কুলগাছ, আমগাছ, ধলেশ্বর নদী, বাবুদের মটর মটর ক্ষেত, চালভাজা, লবণ চা —তবু কত ভালোবাসা। ভাই বোন, দিদি খেপলিমনি সবাইকে ভালোবাসতো। শহরে বাবুদের বাড়িতে কাজ করতে এসে সবকিছু হারিয়ে যায় সবকিছুই যেন ব্যথা ভরা চোখে স্বপ্নের মতো মনে হতে শুরু করে। শুধু কাজ আর কাজের পরে কাজ কোথাও যেন শান্তি নেই। মারধর, অযত্ন, অবহেলা সহ্য করে থাকে। এদিকে দেবপ্রিয়া সেমিনারের উপর সেমিনার করতে থাকে শিশুশ্রমের উপর। ডাটা সংগ্রহ করছে ভারতে কোথায় কজন শিশু শ্রমিক আছে এবং অপুষ্টিতে ভুগছে। দেবপ্রিয়া স্বামী তমোজিৎকে জিজ্ঞেস করে,

"আমার কিছু ডাটা চাই। যেমন ধরো ভারতে কতজন শিশুশ্রমিক আছে। এরমধ্যে কতজন অপুষ্টিতে ভুগছে। কতজন... তুমি আমার কথা শুনছো না।"[২৮]

তমোজিৎ নিশ্চুপ, তার উত্তর দেয় না কারণ তমোজিৎ বুঝতে পারে দেবপ্রিয়ার মধুরাবতীর প্রতি অত্যাচার, অবহেলা কথায় কথায় মারধর। তমোজিৎ মধুরাকে সন্তানের চোখে দেখত যা তার স্ত্রী মেনে নিতে পারে না।

"কি বললে তিতলির সঙ্গে মধুরার তুলনা করছো?"[২৯]

কথাটি থেকেই বুঝা যায় দেবপ্রিয়ার শিশুদের প্রতি অসামাজিক মানসিকতা। তমোজিৎ নিজের মেয়ের বয়সী ভেবে আরেকটি জামা আনার কথা বলায় দেবপ্রিয়া কিছুক্ষণ পরেই মধুরাকে খুব মারধর করে মিটিংএ চলে যায়। মধুরা বুঝে উঠতে পারে না কেন তাকে মারলো। সারবাঁধা নাগেশ্বর গাছ, তার ফুল; শেফালি ফুলের ঘ্রাণ আর ফোটা স্থলপদ্ম দেখে তার শিশুমন উৎফুল্ল হয়ে ভাবে করমপূজা এসে গেছে। এরপরই তো দুর্গাপূজ। কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতার যান্ত্রিক মানুষ ওই বাচ্চা মেয়েটাকে কি নিষ্ঠুরভাবে যন্ত্রণা দেয়, অত্যাচার করে তাই এই গল্পের মূল বিষয়। যেভাবে মমত্ববোধে খুঁটে খুঁটে গল্পকার মধুরাবতীর অতীত জীবন কথা শোনান, পাশাপাশি তমজিৎ ও দেবপ্রিয়ার জীবনযাত্রা প্রণালী বানানো কৃত্রিম লাগে। এটা ঠিক শহরে আধুনিক মানুষের জীবন কৃত্রিমতায় মোড়া ফাঁপা। কিন্তু এই জীবনের কথা বিশ্বস্ত ভাবে লেখক বলেননি কেমন ছাড়া ছাড়া

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 114 - 125
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আলাদা। সম্ভবত লেখকের এদের জীবনের সম্পর্ক দেখানো উদ্দেশ্য ছিলো না। তিনি ওই ছোট্ট মেয়েটি মধুরাবতীর জন্য আমাদের মন কেমন করে।

'শ্রীমতি চলে...' গল্পে সদ্য জেল ফেরত শ্রীমতী অরণ্যপুরের জগৎ বাউড়ির বেটি শ্রীদামের বউ সে কেমন চলে মাথা নিচু করে।

> "শ্রীমতি মাথা নিচু করে পেরিয়ে এল বটতলা। এখন নেমে গেল মাঠে। তেরচা হয়ে মাঠ পেরোলে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে ঘরে। আজ হাইলাকান্দি জেল থেকে ছাড়া পাবে জানে তো শ্রীধাম তবু শ্রীমতীকে আনতে গেল না কেন জেল থেকে ছাড়া পাবে জানেন তো শ্রীদান তবু শ্রীমতিকে আনতে গেল না কেন?"[৩০]
>
> "নীল শাড়ি শ্রীমতি চলে।"[৩১]

গল্পের ধ্রুবপদ হতে পারতো এই গানের লাইন। নিজের ইজ্জত বাঁচাতে শ্রীমতি ডাকাত ভুতুকে দা দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছিল। এই সহজ সরল শ্রীমতীর ইজ্জত আরোও অনেকে লুটতে চেয়েছে অরণ্যপুরে। কিন্তু কিন্তু সে কখনোই হতে চায়নি বহুবল্লভা। শ্রীমতি শিরিমতি পতিপ্রেমে নিষ্ঠাবতী। কোনো প্রলোভনে ফাঁদেই সে পা বাড়ায়নি। খুনি ডাকাত ভুতুকে মেরে বিচার ব্যবস্থার কাছে তার ইনাম জুটেছিল চার বছরের হাজত বাস।

> "এক এক করে কেটে গেল চারটা বছর।"[৩২]

হাজতে বসে প্রতিটি মুহূর্তে এসে তার পরিপার্শ্বে মা বাবা, ঘর সংসার, স্নেহময়ী শাশুড়ি ও বরের কথা ভেবেছে। কিন্তু ঘরের দরজায় ফিরে এসে তার বুক ভেঙ্গে যায় বর শ্রীদাম তার জন্য অপেক্ষা করে থাকেনি। শ্রীদামের মতো ভোগী পুরুষ নারীর প্রেমের মর্ম বোঝে না। তাই কথাও রাখেনা। যার জন্য খুন করে নিজের ইজ্জত বাঁচালো শ্রীমতী সে যদি কথা না রাখে তবে শ্রীমতি কি করতে পারে? গল্পকার উপসংহারে লিখলেন -

> "ধুর্ ধুর্ কিসের ইজ্জত। কিসের সতীত্ব? কতটা থুথু ফেলল শ্রীমতী। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। বাপের ভিটাটা কি একবার দেখতে যাবে? না, - থাক্। এখন ওই পথ দিয়েই আবার জোৎস্না মেখে ফিরে যাচ্ছে শ্রীদামের বউ নয়, জগৎ বাউরির বেটি নয়। হাঁটছে শ্রীমতী। হাঁটুক..."[৩৩]

এখন যদি আবার পরিচিত পথ ধরে ফেলেছে তাহলে বুঝতে হবে প্রতিহিংসা পরায়ণা হয়ে উঠেছে। শ্রীমতী ভিতরে ভিতরে এবার হয়তো তার বরকে খুন করে হাজতে যাবে। গল্পকার এভাবে শ্রীমতির মতো অসংখ্য নারীর অবস্থার পরিণতি সম্বন্ধে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন শ্রীমতি নামের এক নজির। স্ত্রীধর্ম পালন করতে গিয়ে শত নারীরা নিজের অবস্থান সম্বন্ধে সন্দিহান। 'স্বপ্নগন্ধার খোঁজে' গ্রন্থে 'আবর্ত' গল্পেও প্রতি রাতে নারীর কামনার বলি হওয়া, অসহায়ত্ব, সমাজে জাত পাতের নিয়ম নীতি, অভাব ও দুঃখ দুর্দশার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অন্ধকার জীবন কাটানোর কথাও রয়েছে। তাই শ্যামলী নামের মেয়েকে বলতে শোনা যায় -

> "কি করে জানবো দিদি? কত মানুষ সারারাত আমার শরীরটার উপর অত্যাচার করে। তারপর দু'টাকা, পাঁচ টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে চলে যায়। ...ক্ষুধা আর কদ্দিন সহ্য করা যায় বলো কদ্দিন।"[৩৪]

উল্লেখের দাবি রাখে এরকম 'স্বপ্নগন্ধার খোঁজে' গল্পগ্রন্থে বারবার লাঞ্ছিত হয়েছে পুরুষের কাছে নারীকে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে বেঁধে দিয়ে দাসীর মতোই বন্দী জীবন কাটাতে বাধ্য করা হয়েছে। শত লাঞ্ছিত হয়েও নারীরা মুখ ফুটে কথা বলতে পারেনি, প্রতিবাদ করতে পারেনি নিজের সামান্য অধিকারের জায়গাটুকুও বুঝতে পারেনা। পতি পরমগুরু, পতিবিনে গতি নাই এই ছিল মূলত স্ত্রীশিক্ষার একমাত্র আচরণ বিধি। সমাজে নারীর চূড়ান্ত অবমাননাকর অবস্থায় সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে কুঠারাঘাত করেছিলেন বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবী। নারীর আমি হয়ে ওঠার প্রথম পদক্ষেপ আশাপূর্ণা দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে। সমাজ ও সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর অবস্থানগত সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটেছে এই সূক্ষ্ম পরিবর্তনের ধারাটিকে তিনি দেখিয়ে দেন। ঝুমুর পাণ্ডে এদিক থেকে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 114 - 125
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'সুভদ্রা, মেয়েটা, সাদা গাড়ি এবং...' নামের গল্পটি আসলে ব্রাত্য জীবনের সুখ দুঃখময় জীবনের প্রতিবিম্ব। এক ধরনের ফ্ল্যাশব্যাকে শুরু হয়েছে গল্পটি। একদিন মাতা সুভদ্রার কাছে তাঁর মেয়েটি সাহেবের সাদা জিপসী গাড়ি চড়ার জন্য বায়না ধরেছিল। গল্পের শুরুতেই আমরা দেখি,

> "বড় শখ ছিল মেয়েটার সাহেবের জিপসী চড়বে ।কতদিন চোখ বড় বড় করে দেখেছে গাড়ির ভিতরট।আজ জিপসীতে চড়ল তবে...?"[৩৫]

মেয়েটি জিপসী গাড়িতে শুয়ে আছে তবে মেয়েটা জীবন্ত চঞ্চল দেহ নয়, মেয়েটার ক্ষতবিক্ষত শবদেহটি শায়িত। যে সহজ সরল মেয়েটি শুধু গাড়িটি চড়তে চেয়েছিল কিন্তু জানতো না তাকে জীবন দিয়ে তার দাম মেটাতে হবে। মায়ের আদরে লালিত আট বছরের মেয়ে জীবনের অনিশ্চিত অন্ধকার সম্বন্ধে জানতে পারেনি সে। সম্পত্তি ওয়ালা পুরুষের সঙ্গে বিয়ে করার স্বপ্নের কথা মাকে জানাতে দ্বিধাবোধ করেনি। মেয়েটির এই আকস্মিক জীবন রূপান্তরে পাল্টে যায় ঝুমুরের গল্পের ভাষা। কচুবনের ধারে ডোবার ভিতর একটানা ব্যাঙের কোরাস পেরিয়ে শীতের সরষে ফুলের মন মাতানো গন্ধে যে সুভদ্রার মেয়েটির গায়ে হলুদের বার্তা এসেছিল,

> "আজ বিবর্ণ আকাশে ধূসর মেঘের আনাগোনা আকাশে বকের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। সুভদ্রাও মাথায় চা-পাতার গাঁট নিয়ে নম্বর থেকে ফিরছে। ধূপ ঘরের সামনে জটলা দেখে থমকে দাঁড়ায় সুভদ্রা।"[৩৬]

কারো কারো মুখে শোনা যাচ্ছিল সাহেব কত দয়ালু গাড়ি দিয়েছেন। ভাটি পথ্ রায় মেয়েটার লাশ ভেসে উঠেছিল, কেউবা আবার বলছিল গালে নাকি কোন জন্তুর কামড় পাওয়া গেছে। শেষবারের মতো মেয়েকে দেখে নিতে সবাই বলতে থাকে কারণ, কিছু সময়ের মধ্যে মর্গে নিয়ে যাবে মেয়ের শরীরের কাটা ছেঁড়া করা হবে।

সেই মেয়েরই আজ বিষন্ন বিদায়ের বেহাগের সুর ধ্বনিত হচ্ছিল চতুর্দিকে। সুভদ্রার কোনো সাড়া শব্দ ছিল না দাঁড়িয়ে থাকে, হারিয়ে গিয়েছিল মন প্রাণ মেয়ের মৃত্যুর অসহ্য বেদনায়। সুভদ্রা বুঝতে পারে না, যে মেয়েটি পশু পাখিদের ভাষা বুঝতো, সে কেন মানুষের ভাষা বুঝতে পারলো না?

> "কখনও বিড়বিড় করে বলে— মেয়েটা গাছ লতা-পাতা, ভালোবাসতো গো দেখতো আকাশের মেঘ, বুঝতো পশু পাখিদের ভাষা। কিন্তু হায়রে... জানতো নাগো জানতো না গো...?"[৩৭]

তাকেই বা কেউ বুঝতে পারল না? প্রাসঙ্গিক মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভা নামের মুক মেয়েটির কথা। তাকেও তো কেউ বুঝতে পারেনি, মুক প্রকৃতি ছাড়া। এভাবেই সুভদ্রার মেয়েটিও আকাশচুম্বী কামনার বলি হয়ে হারিয়ে গেল। এভাবে ঝুমুর পান্ডে সুভদ্রার মেয়ের মতো অসংখ্য মেয়েদের জীবনের ব্যাধির মতো কামনার বলি হওয়া দুর্দশা গ্রস্থ অবস্থান, অসহায়ত্বের ছবি তুলে ধরেছেন। পরিশ্রমী খেটে খাওয়া মানুষগুলোর যন্ত্রনাদগ্ধ জীবনের এক করুণ পরিণতির রূপ উন্মোচনে ঝুমুর পান্ডে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

এভাবে উপরে উল্লিখিত বহুমাত্রিক স্বর সংযোজনে বিষয় বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়েছেন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও দুজনের মাঝখানে অসহ্য ভবিষ্যৎ অন্ধকার করা কাহিনী দানা বাঁধে এবং প্রত্যেকবারই সন্তান সম্ভবা নারীর অসহায়ত্ব শোষণ, নির্যাতন প্রবৃত্তি দেখা যায়। 'রাইত পোহাউক', 'বেলবতি' গল্পে স্বামী সেখানে অনিশ্চয়তার দাবি পোষণ করে। সে সেই সন্তানের অভিভাবক কী না স্থির করতে পারেনা। এ প্রসঙ্গে গল্পকার কান্তার ভূষণ নন্দীর 'আমি লছমীর সঙ্গে শুয়ে ছিলাম' গল্পে লছমী নামের মেয়ের সঙ্গে তিন বন্ধুর মদ্যপ অবস্থায় রাত কাটানোর পর প্রভাতে তারা স্থির করতে পারেনা কে ছিল কামনায় লিপ্ত, তিন বন্ধুর দোলাচলচিত্ত যেন অসংখ্য পরকীয়া পুরুষের কাছে স্ত্রী বা নারীর জীবনের অসহায়ত্ব কলুষপূর্ণ নামকরণ। এভাবে কয়েকটি গল্পে নারীর করুণ পরিণতি গল্পের ছত্রে ছত্রে ধরা পড়েছে।

লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন নজির রয়েছে কয়েকটি গল্পে যেমন- 'রূপান্তর', 'মোক্ষদা সুন্দরীর হারানো প্রাপ্তি', 'শ্রীমতি চলে', 'কানাই এর কিছুক্ষণ', সুখগাছের গল্পে টুসু গান, ছড়া, প্রবাদ প্রভৃতি লোক উপাদানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায়, গল্পকারের চিন্তা চর্চার গভীরতা। আমরা জানি ছড়ার মাধ্যমে লৌকিক জীবনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সামাজিক রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিফলন ঘটে।

আরো কিছু গল্প যেগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রকৃতি, ফুল, পাখি প্রভৃতি বিষয়। প্রকৃতির এক বিশেষ স্থান রয়েছে কয়েকটি গল্পে যেমন 'লাল গোলাপের অগস্ত্যযাত্রা', 'কৃষ্ণকলি এবং লাল টুকটুকে পাখি', 'জারুল ফুলের মাস', 'একালের রাজকন্যা শঙ্খমালা এবং একমুঠো বকুল ফুল', 'বিবর্ণ জ্যোৎস্নায়' প্রভৃতি গল্পে। ফুল পাখি প্রভৃতি বিষয় যেন ঝুমুর পান্ডের গল্পের মাঝখানে এক মোহময় পরিবেশ তৈরি করেছে।কখনো বা আবার কাহিনীর গভীরতা প্রাপ্তি বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়েছে। কোন ব্যক্তির না বলা বাণীর মুহূর্ত বোঝাতে নানান ফুল, পাখির কলরব, ডানা ঝাপটানো, অসময়ে পাখির উড়ে চল প্রভৃতি বিষয় যেন ঝুমুর পান্ডের গল্পের মাঝখানে এক ইঙ্গিতধর্মী পরিবেশ তৈরি করেছে। অন্ধকার ও আলো এই দুটি বিষয় ইঙ্গিত ধর্মী পরিবেশ সৃষ্টির মূল কেন্দ্রে কাজ করেছে।

উত্তর পূর্বের গল্পের মূল্যায়ন করতে গিয়ে অধ্যাপক তপধীর ভট্টাচার্য বলেছেন, -

> "ছোটোগল্প যেহেতু সময়ের স্বর ও অন্তঃস্বরকে সূক্ষ্মভাবে ধারণ করে। দেশভাগ নামক আদি পাপ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিচ্ছুরিত দহন যন্ত্রণা অনন্বয়, অনিকেতবোধ এবং অন্তহীন জীবন সংগ্রামের বিবিধ বয়ানেই কালিকযাত্রা প্রতিফলিত হয়। তার ওপরে রয়েছে, উত্তর পূর্বের বাঙালি বসতি গুলিতে রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ, এমনকি আততায়ী সুলভ ভূমিকা।"

উপরিউক্ত ঝুমুর পান্ডের 'স্বপ্নগন্ধার খোঁজে' এবং 'সুখ গাছের গল্প' গ্রন্থ দুটোর আলোচনার শেষে বলা যায়, নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর সামাজিক অবস্থার সংকট, ব্যাক্তি সম্পর্কের ভিত্তিমূল নারী পুরুষের অবস্থানগত বৈষম্য ব্যাধি, আধুনিক ভোগবাদী সমাজ বাস্তবতায় জীবনের উত্থান পতন, জীবন সংগ্রাম, বিপন্ন সময়ের আর্তি, শ্রমজীবী মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় শোষণ, নিপীড়ন অত্যাচার ইত্যাদি বহুমাত্রিক স্বরের সংযোজন করেছেন। গল্পলেখিকা প্রত্যেকটি বিষয়ের রূপ উন্মোচনে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বরাক পারে বসে নিজের চোখে দেখা প্রান্তিক জনজাতি, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাস্তব জীবনের প্রচ্ছন্ন বিষয়কে প্রতিভার আলোকে প্রকাশ করেছেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাহিত্যে। সেক্ষেত্রে লেখিকা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখেন। ভাষার সাবলীল প্রয়োগ, আঞ্চলিক ভাষার যথাযথ ব্যবহার প্রকৃতি সময়, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সম্প্রসারিত বিষয়কে সামনে রেখেই তিনি তাঁর গল্প জগতে এক বৃহত্তর জায়গা করে নিয়েছেন। তাই উত্তর পূর্বাঞ্চল তথা বিভিন্ন দেশে নিজস্ব মৌলিকতার জন্য পাঠক সমাজে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছেন। আগামী প্রজন্মের কাছে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে আশাবাদী।

Reference:

১. চৌধুরী, বিশ্বতোষ (সম্পা), বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা চতুর্দশ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, বরাক উপত্যকার বাংলা কথাসাহিত্য, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় শিলচর ১৯ মে, ২০১৯, পৃ. ৮৩
২. সুবল, সামন্ত (সম্পা), বাংলা গল্প ও গল্পকার, (সপ্তম খন্ড) এবং মুশায়রা ১৫, পোষ ১৪১৯, জানুয়ারি ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ২০২
৩. পান্ডে, ঝুমুর, স্বপ্নগন্ধার খোঁজে, কফি হাউস ২৫ ডি নীলমনি মিত্র রোড, শরৎ ১৪০৬, কোলকাতা, পৃ. ৯
৪. তদেব, পৃ. ১১
৫. তদেব, পৃ. ১১
৬. তদেব, পৃ. ১৬
৭. তদেব, পৃ. ১৬
৮. তদেব, পৃ. ১৬
৯. তদেব, পৃ. ১৬
১০. তদেব, পৃ. ১৬
১১. পান্ডে, ঝুমুর, সুখ গাছের গল্প, সাহিত্য প্রকাশনী কলেজ রোড হাইলাকান্দি, ১লা শ্রাবণ ১৪১২, ১৮ জুলাই ২০০৫, পৃ. ৫৪

১২. তদেব, পৃ. ৫৮
১৩. তদেব, পৃ. ৬০
১৪. তদেব, পৃ. ৬৫
১৫. তদেব, পৃ. ৬৬
১৬. পান্ডে ঝুমুর, স্বপ্ন গন্ধার খোঁজে, কফি হাউস, ২৫ডি, নীলমণি মিত্র রোড, কোলকাতা, শরৎ ১৪০৬, পৃ. ৩৩
১৭. তদেব, পৃ. ৩৩
১৮. তদেব, পৃ. ৩৮
১৯. তদেব, পৃ. ৩৯
২০. তদেব, পৃ. ৬২
২১. তদেব, পৃ. ৬২
২২. তদেব, পৃ. ৬৩
২৩. তদেব, পৃ. ৬৩
২৪. পান্ডে, ঝুমুর, সুখ গাছের গল্প, সাহিত্য প্রকাশনী কলেজ রোড হাইলাকান্দি, ১লা শ্রাবণ ১৪১২, ১৮ জুলাই ২০০৫, পৃ. ১০
২৫. তদেব, পৃ. ১৪
২৬. তদেব, পৃ. ১৫
২৭. তদেব, পৃ. ৩৯
২৮. তদেব, পৃ. ৩৯
২৯. তদেব, পৃ. ৪৫
৩০. তদেব, পৃ. ১৬
৩১. তদেব, পৃ. ১৬
৩২. তদেব, পৃ. ১৬
৩৩. তদেব, পৃ. ২২
৩৪. তদেব, পৃ. ৩২
৩৫. পান্ডে, ঝুমুর, স্বপ্ন গন্ধার খোঁজে, কফি হাউস, ২৫ডি, নীলমণি মিত্র রোড, কোলকাতা, শরৎ ১৪০৬, পৃ. ২৪
৩৬. তদেব, পৃ. ২৮
৩৭. তদেব, পৃ. ২৮